অনন্য এক মায়ের কথা

খন্দকার জাহিদ হাসান

[**ভূমিকাঃ** সাহিত্যের পাতায় কারও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা বা বিবরণের কথা আসতেই পারে। কিন্তু তার উপস্থাপনার ভংগী অবশ্যই সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত হওয়ার দাবী রাখে, যেন তা লেখকের নিজস্ব গন্ডী পেরিয়ে সর্ব-সাধারণের পাঠোপযোগী শাশ্বত কোনো রচনা হোয়ে ওঠে, নতুবা সেটা নিতান্তই হোয়ে দাঁড়ায় কোনো রোজ নাম্‌চা বা ব্যক্তিগত ডায়েরীতূল্য এক দলিল। এভাবে নিজের কথাকে সকলের কথায় পরিণত করার কাজটা কিন্তু মোটেও সহজ নয় এবং ভয়টা সেখানেই।

কে আমি যে,আমাকে লিখতেই হবে আমার প্রয়াতঃ মায়ের কথা? কি আমার যোগ্যতা যে, বিদগ্ধ পাঠক সে লেখা পড়তে আগ্রহী হবেন? এ ধরণের কোনো নিবন্ধ পাঠকবৃন্দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব'লেই আমার ধারণা। তবু মনের কোণে অতি ক্ষুদ্র একটা আশা এই যে, অনেকে হয়তো আমার মায়ের মাঝে তাঁদের নিজেদের জননীর একটা প্রচ্ছায়া খুঁজে পাবেন। অনেক সন্তানের না-বলা কথা হয়তো এই রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। আমার এই সামান্য আশাটুকু যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় কিংবা এই রচনা যদি সর্ব-সাধারণের গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তার জন্য আমি সকলের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।]

(১)

নবজাত শিশুটি হাত-পা ছুঁড়ে ক্রমাগতভাবে কেঁদে চলেছিলো। তাই দেখে শিশুটির মা-ও কাঁদছিলেন। তরুণী মায়ের প্রথম পুত্র-সন্তান। ডিউটিরত নার্স মা-কে জিজ্ঞেস করলেন, ''কি ব্যাপার, আপনি কাঁদছেন কেন? খারাপ লাগছে?'' মা বল্‌লেন, ''হ্যাঁ।'' স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধালেন নার্স, ''কি ধরণের অসুবিধা হচ্ছে আপনার, আমাকে খুলে বলুন।'' মা-র জবাব, ''না, অন্য কিছু না সিস্টার। আমার বাচ্চাটা এত কাঁদছে কেন? কিছু হয়নি তো ওর?'' মিষ্টি ক'রে হেসে উঠলেন সিস্টার, ''দূর পাগলী! কিছুই হয়নি ওর। বাচ্চারা অমন কাঁদেই।''
তারপর শিশুটির উদ্দেশ্যে তর্জনী ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কৃত্রিম ধমক লাগালেন নার্স, ''এ্যাই দুষ্টু, তুই নিজে যতো খুশী কাঁদ্‌। তোর মাকে আবার কাঁদাচ্ছিস্‌ কেন, বল্‌তো-ও-ও-ও—?''

এই হলো আমার মা ও আমার গল্প। অনেকদিন আগের ঘটনা, অথচ মনে হয় এই সেদিনকার। বড়ো হোয়ে বেশ ক'বার মায়ের মুখে গল্পটি শুনেছি। প্রতিবার-ই মা তাঁর কথা শেষ করতেন এই ব'লে, ''কি বোকা ছিলাম তখন আমি!''

(২)

এ এক এমন গ্রহ, যার পরতে পরতে মিশে আছে অনিশ্চয়তা আর সর্বনাশের উপাদান, যার ইতিহাস জুড়ে ব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে বলবানের হোলিখেলা আর দূর্বলের বিনাশলাভের কোটি কোটি নিদর্শন, যার ক্ষমাহীন মাটিতে বিবর্তনের আসুরিক প্রক্রিয়া ঘটিয়েছে প্রাণের বিকাশ। এ মাটিতে অসহায় মৃগশিশুর আত্মাহুতির মাধ্যমে পুষ্টিলাভ করে হিংস্র শ্বাপদের দেহ। এ মাটিতে অহরহ পোকা-মাকড়ের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরে কাক ও শকুনদের অগোচরেই। এ মাটিতে আজ রাতে কোন্‌ শিশুটি না খেয়ে ঘুমাতে গেল, তাতে কারও কিচ্ছু যায় আসে না।

তত্ত্ব বলেঃ অজ্ঞাত কোনো এক কারণে বিলুপ্ত না হ'লে ডাইনোসর-ই হয়তো আজ পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করতো। সু-সংবাদ হচ্ছেঃ মানুষ এলো। তাদের অনেকেই

অন্ততঃপক্ষে নিজ প্রজাতির গন্ডীর মধ্যে হলেও বিবর্তনের আসুরিক প্রক্রিয়াকে পালটে দিতে চাইলো। দূর্বলের বেঁচে থাকার অধিকারকে তারা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ঠ হলো। 'শুধু আমার সন্তান নয়, সকলের সন্তান-ই যেন থাকে দুধে-ভাতে!'— এই আপ্তবাক্য তারা মনেপ্রাণে ধারণ করলো।

আবার দুঃসংবাদ হচ্ছেঃ মানুষকে নিয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি হলো। বলবানের বলের সাথে যুক্ত হলো অবিশ্বাস্য রকমের যত কূটবুদ্ধি, হেতু যার 'সীমাহীন লোভ'। যা কিছুই তার জন্য আবশ্যকীয়, তা সে অর্জন করলো। যা কিছু তার জন্য অপরিহার্য নয়, তাও সে যে-কোনোভাবেই হোক হস্তগত করলো। মেধার বিনষ্টি আর সম্পদের অপচয়কে সে বিলাসিতা, আরাম, আভিজাত্য, স্ট্যাটাস, প্রভৃতি নামে ভূষিত করলো। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মনুষ্য প্রজাতির অভিধানেই এই সব সংজ্ঞার অবস্থান। কে জানে, জগৎ সংসারে এর নিগূঢ় কোনো তাৎপর্য রয়েছে কিনা। সৃষ্টিরহস্য বড়োই বিচিত্র। আরও বেশী বিচিত্র এই সৃষ্টির হেতু-রহস্য।

আমার মা বিরাট কোনো দার্শনিক, অসাধারণ কোনো চিন্তাবিদ কিংবা যুগান্তকারী কোনো সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। তবে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রায়ই তিনি ভাবতেন ও আমাদের সাথে মত-বিনিময় করতেন। মানুষের বঞ্চনা আর শিশুদের যাতনা তাঁকে দারুণভাবে কষ্ট দিতো। প্রায়ই তিনি বিষণ্নতায় মুষড়ে পড়তেন আর বলতেন, ''আচ্ছা, শিশুরা কষ্ট পাবে কেন, বল্‌তো? অন্য সকলের কষ্ট যদি মেনেও নিই, শিশুদেরটা মেনে নেওয়া যায় না। কিছুতেই না!!''
আর তিনি লিখতেন। হৃদয়ের আগল খুলে লিখে যেতেন মানুষের কথা, প্রকৃতির কথা, পৃথিবীর কথা।

এ কথা বলবো না যে, আমার মা ছিলেন আনন্দময়ী দেবীর সমকক্ষ। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর স্নেহের ছায়ায় বিরাম নিয়ে ধন্য হোয়েছে অনেক স্নেহের কাংগাল। তাঁর নির্মল সখ্যতার পরশে উষ্ণ হোয়েছেন তাঁর অনেক বন্ধুস্থানীয় সহকর্মী ও সাহিত্যামোদী মানুষ।

(৩)

আমরা এমন এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, যেখানে 'নারীর অধিকার' বড়োই ঠুন্‌কো একটি বিষয়। এ সমাজে হাজারো প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য নারী সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে অবশেষে একদিন পৃথিবীর বুক থেকে চির-বিদায় নেন পরিত্যক্ত জঞ্জালের মত। এ সমাজে বিয়ের পরে অনেক কণ্ঠশিল্পী বধূ চিরতরে হারান তাঁদের কণ্ঠ-বৈভব। অনেক প্রতিভাময়ী কবি, সাহিত্যিক, নর্তকী, অভিনেত্রী কিংবা চিত্রশিল্পী ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হতে হতে শেষ পর্যন্ত নামহীনা এক ঘরণীতে পরিণত হন।

তবে আমার মায়ের ক্ষেত্রে তার উল্টোটা ঘটেছিলো। এর পুরোপুরি কৃতিত্বটা ছিলো তাঁর-ই। যখন তিনি কিশোরী ছিলেন, তখনই তাঁকে বসতে হোয়েছিলো বিয়ের পিঁড়িতে। সেই বয়সে প্রতিভার বিকাশ তো দূরের কথা, সাধারণ বোধোদয়ও মানুষের হওয়ার কথা নয়। ততোদিনে পুতুল খেলার বয়স তিনি পেরিয়েছিলেন ঠিক-ই, কিন্তু শালুক তোলা কিংবা মালা গাঁথার বয়সটা তখনও ছিলো তাঁর। এরপর আর দশটা গৃহবধূর মত শুরু হলো তাঁর স্বামীর সংসার। একে একে চারটি পুত্র-সন্তান এলো তাঁর কোলে। স্বামী-সন্তান ছাড়াও শ্বশুরবাড়ীর একাধিক আশ্রিত পরিজনদের সেবা-যত্ন ও লালন-পালন করার কাজটুকু হাসিমুখে সমাধা ক'রে চললেন তিনি। কিন্তু এর-ই মাঝে আলোর পথে আমার নবীনা মায়ের যাত্রা থেমে থাকলো না। সে আলো ছিলো শিক্ষার আলো, জ্ঞান-সাধনার আলো, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলো!

সন্তানকোলে একে একে বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ের বৈতরণী পার হোয়ে অবশেষে মা অর্জন করলেন শিক্ষক প্রশিক্ষণে স্নাতক ডিগ্রী। সমান্তরালভাবে তিনি

তাঁর শিক্ষকতা পেশাকে বে-সরকারী বিদ্যালয় থেকে স্থানান্তর করলেন সরকারী বিদ্যালয়ে। লেখালেখির ভূবনে শুরু হলো তাঁর পদচারণা। কবিতা, ছোটগল্প আর উপন্যাস রচনার পাশাপাশি বেতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও রাজশাহী শহরের ছোটো গন্ডীতে সীমিত পর্যায়ে হ'লেও মঞ্চাভিনয়ে তিনি উৎসাহিত হোয়ে উঠলেন।

(৪)

মা মনে-প্রাণে একজন কবি ছিলেন। কোনো কবিতা রচিত হওয়ামাত্রই তা শোনার জন্য উপযুক্ত কাউকে হাতের কাছে পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে উক্ত কবিতা শুনতে হতো। সেই শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যমনা কোনো প্রতিবেশী থেকে শুরু ক'রে একেবারে কবি শামসুর রাহ্‌মান পর্যন্ত। তাঁর দরদ-মাখা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মা যখন আবৃত্তি ক'রে যেতেন, তখন তা কারো ভালো না লেগে উপায় ছিলো না। তবে শুধুমাত্র তাঁর কণ্ঠের আবেগের কারণেই নয়, সে সব কবিতা ভালো লাগার অন্যতম কারণ ছিলো সেগুলোর গুণগত উৎকর্ষতা।

অনেক পাঠক মনে করেন যে, দূর্বোধ্যতা বোধহয় উঁচু মানের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য যে, এটি একটি ভুল ধারণা। কবিতায় এক ধরণের প্রহেলিকা, কুয়াশাচ্ছন্নতা কিংবা রহস্যময়তা থাকলেও থাকতে পারে এবং এগুলো অনেকসময় কবিতাকে আরও আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। কিন্তু তাই ব'লে অর্থহীন দূর্বোধ্যতা মোটেও কাম্য হতে পারে না। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিষ্ঠিত কবিদের কারো কোনো কবিতাই এই দোষে দুষ্ট নয়।

মায়ের কবিতাগুচ্ছ কতোটুকু শিল্পোত্তীর্ণ হতে পেরেছে, তা কালের বিচারসাপেক্ষ একটি ব্যাপার। তবে এ-কথা সত্যি যে, তাঁর কবিতা ভাষায় প্রাঞ্জল, বক্তব্যে বোধগম্য ও রচনা-শৈলীতে হৃদয়স্পর্শী। সাহিত্যের জগতে তিনি 'খন্দকার জাহানারা বেগম' নামে সুপরিচিত ছিলেন। আজও আমার পরিষ্কার মনে আছেঃ সাহিত্য চর্চার উৎসাহ মায়ের দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যখন থেকে আমাদের বাসায় বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি বন্দে আলী মিঞার আনাগোণা শুরু হয়।

শান্ত-সৌম্য এই প্রবীণ কবি তাঁর এক মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান রঞ্জু ও এক প্রিয় সহচর সাহিত্যপ্রেমী জনাব আবদুল গণিকে নিয়ে সন্ধ্যার পরপর-ই আমাদের 'ছায়ানীড়'-এ হাজির হোয়ে যেতেন। ঘরের মধ্যে বসাটা কবির মোটেও পছন্দের কোনো ব্যাপার ছিলো না। আড্ডা বসতো উন্মুক্ত উঠোনে। ছোট্টো একটা চায়ের টেবিলকে ঘিরে বেশ ক'টা চেয়ার পাতা হতো। আমাদের অতিথি কবি ঝাঁকড়া বাবরী চুল নিয়ে সেগুলোতে বসে পড়তেন তাঁর সংগী-সাথীসমেত। এছাড়া বসতেন আমাদের মা-বাবা। কিশোর ও বালক বয়সের আমরা চার ভাই বেশীর ভাগ সময়েই খেলাধূলায় মগ্ন থাকতাম কিংবা একটু দূরে বসে সবকিছু লক্ষ্য করতাম। আবার মাঝে মাঝে আমরা সমবেত বয়োজ্যেষ্ঠদের আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম কিংবা ছোটো ছোটো টুলে বা মোড়াতে বসতাম।

আকাশের চাঁদ আমাদের আংগিনায় সানন্দে জোছনা ফেল্‌তে আরম্ভ করতো। পাশেই থাকতো গোলাপের ঝাড় (পাদটীকায় দ্রষ্টব্য)। আরেক দিকে দু'টো করবী গাছ। হাস্নুহেনা ছড়াতে শুরু করতো তার মাতাল করা সৌরভ। এই গাছগুলো সব-ই মায়ের হাতে লাগানো ছিলো। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন তেমন থাকতো না এবং কবি সেটা পছন্দও করতেন না। চায়ের সাথে সামান্য মুড়ি কিংবা নোন্‌তা বিস্কুট হলেই তাঁর চলতো। কবিপুত্র রঞ্জুর যৎসামান্য মানসিক প্রতিবন্ধিতা ছিলো এবং আরো বেশী খাবারের জন্য সে মাঝে মাঝে উৎসাহ প্রকাশ করতো। কিন্তু ওর বাবা তার সেই অতিরিক্ত আগ্রহ আস্তে ক'রে দমন ক'রে দিতেন মৃদু স্বরে এই ব'লেঃ ''রঞ্জু, বাইরে এত খেতে নেই, বাসায় ফিরে খাবে।'' রঞ্জু তার বাবার কথায় তখনকার মত নিরস্ত হলেও পরদিন সকালে বা দুপুরে একাই আমাদের বাসায় হাজির হোয়ে যেতো আগের সন্ধ্যার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য।

আমার মা ছেলেটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে খেতে দিতেন। রঞ্জু গোগ্রাসে খেতে খেতে অস্ফুট ভাষায় বলতো, ''খালা আপনি খুব ভালো। আমি যে এসেছিলাম, তা আব্বাকে জানাবেন না, হ্যাঁ....?''

(৫)

সেইসব সান্ধ্যকালীন আসরে ভোজনের অবস্থা যেমন-তেমন হলেও যা বিস্তর পরিমাণে থাকতো, তা হলো কথা-বার্তা, খোশ-গল্প আর স্মৃতিচারণ। আমাদের বাবা কথা বলতেন বেশ উঁচু স্বরে, মা মাঝারী স্বরে, আর কবি বন্দে আলী মিঞা ও তাঁর সহযোগী ভদ্রলোকের কণ্ঠ প্রায় শোনাই যেতো না। কবি তেমন বাগ্মী ছিলেন না বটে, তবে তাঁর স্মৃতির অফুরন্ত ভান্ডার হতে তিনি যে সকল গল্প বের ক'রে আনতেন, সেগুলো ছিলো অত্যন্ত বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর। তার মধ্যে আবার বেশ কিছু ঘটনা ছিলো স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, কবি বন্দে আলী মিঞার সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিলো কোলকাতায়। তাঁর যৌবনকালে তিনি সুদীর্ঘ সময় কাটান সেখানে। সেই সময় তিনি একাধিকবার কবিগুরু ও কবি নজরুলের সাহচর্যে আসেন। তখনকার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এমন দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যা অত্যন্ত বিচিত্র। বর্তমান স্বল্প পরিসরে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে-মধ্যে ঘরোয়া সেই আসরগুলোর বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে যোগ হতো মায়ের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও বাবার দরাজ গলায় সংগীত পরিবেশন। উঠোনে মাদুর বিছিয়ে বাবা যখন হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরতেন, তখন তাঁর তবলা-সহযোগী হিসাবে বসে পড়তাম আমি এবং প্রায়ই কণ্ঠ-সহযোগিতায় নেমে পড়তেন মা। আর কোনো সাঁঝে যদি আমার তবলার ওস্তাদ এসে পড়তেন, তা হলে তো আর কোনো কথাই ছিলো না, চারপাশ আরও আনন্দ-মুখর হোয়ে উঠতো।

(৬)

সেই সব সোনাঝরা দিনগুলো চঞ্চল প্রজাপতির মত রংগীন ডানাতে ভাসতে ভাসতে কোথায় যে হারিয়ে গেল, তা ভাবতেই এখন দূঃখে যেন বুকটা ভেংগে যায়! স্মৃতির আলাপচারিতায় সম্প্রতি একদিন কথা হচ্ছিলো মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সিডনী শাখার সভাপতি ও একুশে বেতারের কর্ণধার জনাব মিজানুর রহমান তরুণের সংগে। কবি বন্দে আলী মিঞার কথা উঠতেই চির-তরুণ এই ভদ্রলোক উল্লাসে ফেটে পড়লেন, ''আরে বলেন কি! উনি তো আমার নানার আপন ছোটো ভাই ছিলেন। তাঁকে ঘিরে আবার আপনাদের এত গল্প রয়েছে? তাজ্জব ব্যাপার তো! দুনিয়াটা সত্যিই একটা আজব জায়গা!!'' আমি হাসিমুখে যোগ করলাম, ''তরুণভাই, দুনিয়াটা শুধু এক আজব জায়গাই নয়, বড্ডো ছোট্টো!''

(৭)

মা আমার সফল হোয়েছেন তাঁর চারটি সন্তানকে ঠিকমত 'মানুষ' ক'রে তুলতে। সন্তানদের শিক্ষিত ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর ভূমিকা ছিলো অনবদ্য। তাঁর কোনো কন্যা-সন্তান ছিলো না। কিন্তু বিভিন্ন গরীব অসহায় পরিবার হতে আসা মোট ছয়টি অনাথা 'কাজের মেয়ে'-কে তিনি একে একে নাবালিকা অবস্থা থেকে শুরু ক'রে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করেছেন এবং এরপর নিজ খরচে তাদের প্রত্যেকের বিয়ে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাদের প্রত্যেককে সৎপাত্রের হাতেই ন্যস্ত করা হোয়েছিলো। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শুধু একজন বাদে বাকী পাঁচজন-ই স্বামী-সন্তান নিয়ে সুন্দরভাবে ঘর-সংসার করতে সক্ষম হোয়েছে এবং এখনো তারা সবাই মোটামুটি সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

আমাদের দেশে কোনো গরীবের সন্তান নিতান্ত অসহায় হোয়েই অভাবে প'ড়ে সংগতিপূর্ণ মানুষের দ্বারস্থ হয় 'কাজের মানুষ' হিসাবে। অক্লান্ত কাজের বিনিময়ে সামান্য খাওয়া-পরা ও অল্পবিস্তর স্নেহ-মমতার আশাতেই তারা অন্যের বাসায় কাজ করতে যায়। যখন তারা কোথাও সেটা পেয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোনোখানে চলে যাওয়ার চিন্তা আর তাদের মাথায় থাকে না। আমাদের বাসাতে কাজ করতে আসা মেয়েরা সব সময়েই সেটা পেয়েছে এবং তাই তাদের কাজের শেষ দিন পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই আমাদের পরিবারের প্রতি বিশ্বাসী ও আন্তরিক থেকেছে। এমনকি বিয়ের পরেও অভাবে-অনটনে তারা আমাদের পরিবারের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে। কেউ কেউ আবার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে জমি বা দোকান ক্রয়ের টাকাও লাভ করেছে। তাই সংগত কারণে তাদের প্রায় সকলেই কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ আজও সুখে-দূঃখে, পরবে-পাবণে আমাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এই যে এত বড় একটা সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে, এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আমাদের মা এবং এর সিংহভাগ কৃতিত্ব তাঁর-ই।

খন্দকার জাহিদ হাসান, ০৬/০১/২০০৭,

ইমেইল # zkhondke@bigpond.net.au

[পাদটীকাঃ আমার মায়ের নিজহাতে লাগানো গোলাপের ঝাড়টি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর একটানা ফুল দেওয়ার পর গত অক্টোবর (২০০৬) মাসে অর্থাৎ মা মারা যাওয়ার মাত্র একমাস আগে অজ্ঞাত কোনো এক কারণে মরে যায়। পৃথিবীটা আসলেই একটা বিচিত্র জায়গা!]

(পরের সংখ্যাতে শেষ হবে)